চন্দনা সান্যাল - এক কিশোর গেরিলা মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধকথা - স্মৃতিচারণ

magazine.anupranon.com/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3/%E0%A6%8F%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B/

June 15, 2024

বীর মুক্তিযোদ্ধা দেবেশ চন্দ্র সান্যাল আমার পিতা। তাঁর বাড়ি সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার হাবিবুল্লাহনগর ইউনিয়নাধীন রতনকান্দি গ্রামে। তিনি ১৯৭১ জাতির ক্রান্তিকালে জীবনপণ মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

তিনি তখন ছিলেন রতনকান্দি আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। তিনি তদানীন্তন শাহজাদপুরের এমপিএ এ্যাড. জনাব মো. আব্দুর রহমান ও অন্য ২২ জনের সাথে একযোগে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারত গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। তিনি ভারতে প্রশিক্ষণ নিয়ে একটি গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপের একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দেশের অভ্যন্তরে এসেছিলেন। তিনি দেশের অভ্যন্তরে এসে পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকারদের বিরুদ্ধে ৩টি 'হিট এন্ড রান' কর্মসূচি ও ৪টি ভয়াবহ সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর গ্রুপ কমান্ডার ছিলেন জনাব এম. এ. মান্নান। ৭ নম্বর সেক্টরের হেড কোয়ার্টার ভারতের তরঙ্গপুর থেকে একটি গেরিলা গ্রুপ করে দিয়ে ছিলেন। প্রথমত তাঁর গ্রুপের ভারতীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা সংখ্যা ছিল ১০ জন। তাঁরসহ যোদ্ধারা হলেন ১. রবীন্দ্রনাথ বাগচী, ২. মো. নজরুল ইসলাম, ৩. রতন কুমার দাস ও অন্য ৬ জন। তাঁর গ্রুপ যুদ্ধের পাশাপাশি রাজাকারদের সাথে যোগাযোগ করে দেশের স্বাধীনতার পক্ষে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তিনি দুই জন গ্রুপ কমান্ডারের অধীনে চারটি ভয়াবহ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে রণাঙ্গনে তিনি ছিলেন দুঃসাহসী। তার ধীতপুর যুদ্ধ গ্রুপ কমান্ডার রবীন্দ্রনাথ বাগচী। তার বীরত্বের কথা উল্লেখ করে যে প্রশংসাপত্র দিয়েছেন। তাতে তিনি তার সাহসিকতার জন্য খেতাব পেতেন। কিন্তু নিভৃত গ্রামের অল্প বয়সী মানুষ হওয়ায় নিয়ম না জানায় আবেদন করেন নাই। যে কারণে তিনি কোনো বীরত্বপূর্ণ পদক পান নাই। তিনি দুই জন গ্রুপ কমান্ডারের অধীনে ৪টি ভয়াবহ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তাঁর অংশগ্রহণ করা যুদ্ধ হলো—

কমান্ডার জনাব এম এ মান্নান-এর অধীনে বেলকুচি থানা আক্রমণ যুদ্ধ ও সিরাজগঞ্জ উপজেলার তৎকালীন থানার্কালিয়া হরিপুর রেলওয়ে স্টেশন রাজাকার ক্যাম্প এ্যাম্বুস। কমান্ডার রবীন্দ্রনাথ বাগচীর অধীনে বেলকুচি উপজেলার তৎকালীন থানারকল্যাণপুর যুদ্ধ ও শাহজাদপুর উপজেলার তৎকালীন থানার্ধীতপুর নামক যুদ্ধে। তিনি ছিলেন অকুতোভয়। বাবার কাছে তার যুদ্ধকথা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমাদের গ্রুপ আমরা যে চারটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ছিলাম তা হলো—

বেলকুচি থানা আক্রমণ যুদ্ধ

বেলকুচি সিরাজগঞ্জ জেলার একটি উল্লেখযোগ্য থানা। এই থানা আক্রমণ যুদ্ধে নেতৃত্বে ছিলেন গ্রুপ কমান্ডার জনাব এম এ মান্নান স্যার। ২৪ অক্টোবর ১৯৭১, কমান্ডার স্যারের ও আরও ৩ জনের রেকিতে একযোগে বেলকুচি থানা ও মুসলিম লীগ নেতা মো. আব্দুল মতিনের বাড়ি আক্রমণ করেছিলাম। সন্ধ্যায় বানিয়াগাতি শেল্টারে কমান্ডার স্যার বিস্তারিত ব্রিফ করেছিলেন। কমান্ডার স্যার আমাদের গ্রুপকে দুই গ্রুপে ভাগ করে দিয়েছিলেন। সিদ্ধান্ত ছিল কমান্ডার স্যারের নেতৃত্বে বড় গ্রুপটি থানা আক্রমণ করবে। অন্য গ্রুপটি রবীন্দ্রনাথ বাগ্চীর নেতৃত্বে মতিন সাহেবের বাড়ি আক্রমণ করে মতিন সাহেবকে ধরে আনবে। আমি কমান্ডার স্যারের গ্রুপে থেকে থানা আক্রমণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ছিলাম। রাত ৯টায় বানিয়াগাতি শেল্টার থেকে যাত্রা করে ছিলাম। থানার কাছে গিয়ে দু গ্রুপ টার্গেটের উদ্দেশ্যে ভাগ হয়েছিলাম। রাত ১২টায় একযোগে আক্রমণের সিদ্ধান্ত। পরিকল্পনা মোতাবেক থানার পশ্চিম পাশ দিয়ে স্ক্রলিং করে থানার সামনে যেতেই সেন্ট্রি দেখে ফেলেছিল। হুইসেল বাজিয়ে থানার সবাইকে জানিয়ে দিয়ে আমাদের লক্ষ্য করে সেন্ট্রি গুলি করেছিল। তারপর আমাদের গ্রুপ কমান্ডার জনাব এম এ মান্নান কমান্ড করে ফায়ার ওপেন করেছিলেন। তারপর সবাই একযোগে গুলি শুরু করেছিলাম। প্রায় একঘণ্টাব্যাপী যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধটি ছিল ভয়াবহ। আমার মাথায় হেলমেট ছিল। দুইটি গুলি এসে আমার হেলমেটে লেগেছিল। আমার ডান পাশে অবস্থান নিয়ে ছিলেন এই যুদ্ধের কমান্ডার। আমাদের গ্রুপে তখন ২৭ জন মুক্তিযোদ্ধা ছিল। বিজয় আর না হয় মৃত্যু ছাড়া কোনো পথ ছিল না। বৃষ্টির মতো গুলি চালিয়েছিলেন। আমাদের গুলির কাছে হেরে গিয়ে থানার বিহারি পুলিশ ও রাজাকারেরা থানার পেছন দিক দিয়ে পালিয়ে সোহাগপুর নদীতে থাকা একটি লঞ্চে আমাদের রেঞ্জের বাইরে যমুনার মধ্যে চলে গিয়েছিল। থানার সেন্ট্রি গুলি করা বন্ধ করে দুই হাত উপরে তুলে আত্মসমর্পণ করল। তারপর আমরা সবাই থানার ভেতরে ঢুকে পড়েছিলাম। থানার মালখানা থেকে সকল অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়েছিলাম। সেন্ট্রিসহ থানার দুজন রাজাকারকে জ্যান্ত ধরে নিয়ে এসেছিলাম। ভোর হয়ে গিয়েছিল। মতিন সাহেবের বাড়ি আক্রমণ করা দলটিও এল। মতিন সাহেব পালিয়ে গিয়েছিলেন। তাকে ধরা সম্ভব হয় নাই। মুক্তিযুদ্ধকালীন অধিকাংশ বাড়ি ও দোকানে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা তৈরি করে রেখেছিল। থানার আশপাশের লোকজন দোকান ও বাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। বিজয়ী হয়ে আমরা শেল্টারে চলে এসেছিলাম। পরদিন সিরাজগঞ্জ থেকে শতাধিক পাকি হানাদার সৈন্য ও রাজাকাররা এসে থানার আশপাশে আগুন দিয়েছিল এবং মানুষদের নির্যাতন করেছিল।

কালিয়া হরিপুরের যুদ্ধ

কালিয়া হরিপুর স্টেশন সংলগ্ন ব্রিজ পাহারারত রাজাকার ক্যাম্প এ্যাম্বুস। কালিয়া হরিপুর সিরাজগঞ্জ জেলার সদর থানার একটি রেলওয়ে স্টেশন। এই এ্যাম্বুসের নেতৃত্বে ছিলেন গ্রুপ কমান্ডার জনাব এম এ মান্নান। ৪ নভেম্বর ১৯৭১ গ্রুপের ঝাঐল গ্রামের সিরাজগঞ্জের এমএনএ মোতাহার হোসেন তালুকদারের ভায়রা আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আব্দুল হামিদ তালুকদারের রেকির ভিত্তিতে কালিয়া হরিপুর রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন ব্রিজ পাহারারত রাজাকার ক্যাম্প অ্যাম্বুস করে ছিলাম। কমান্ডার স্যার ক্রলিং করে রেল লাইনে বৈদ্যুতিক মাইন বসিয়ে এসেছিলেন। গ্রুপ কমান্ডার স্যার উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করে ছিলেন। আমরা সবাই ধানখেতের মধ্যে পজিশন অবস্থায় ছিলাম। কামান্ডার স্যারের হাতে মাইনের তার ও ব্যাটারি। টর্চলাইট ও হ্যারিকেন হাতে পাকি মিলিশিয়া ও রাজাকারেরা টহল দিচ্ছিল। ওদের পায়ে লেগে হঠাৎ আমাদের মাইনের তার বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। মাইনটি পাকি হানাদারদের নজরে পড়েছিল। পাকি হানাদাররা হুইসেল দিয়ে রাজাকারদের লাইং পজিশনে রেডি থাকতে কমান্ড করল। আমাদের দিকে

টর্চলাইট মেরে মেরে উর্দুতে বকাবকি করতে থাকল। ইতোমধ্যে ঈশ্বরদী থেকে সিরাজগঞ্জগামী পাকি হানাদারবাহী ট্রেন এল। পাকি হানাদারেরা সিগন্যাল দিয়ে। স্টেশনে ট্রেনটি থামিয়ে দিল। ট্রেনের পাকি হানাদারেরা অস্ত্র তাক করা অবস্থায় নেমে আমারকে খুঁজতে থাকল। আমাদের মাইনটি ব্লাস্ট করা সম্ভব হলো না। পাকি হানাদারদের সংখ্যাধিক্যতায় ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে কমান্ডার স্যার উইথড্র হওয়ার কমান্ড করলেন।

আমরা ক্রলিং করে কিছু দূর পিছিয়ে এসে তামাই গ্রামে চলে এসেছিলাম। পরের দিন সিরাজগঞ্জ থেকে পাকি হানাদার ও রাজাকারেরা এসে কালিয়া হরিপুরে ও আশপাশে বিভিন্ন গ্রামের অনেক বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল এবং গ্রামের অনেককে ধরে নির্যাতন করেছিল। তারা কালিয়া হরিপুর রেলওয়ে ব্রিজ সংলগ্ন রাজাকার ক্যাম্প এ্যাম্বুস থেকে ফিরে এসে তামাই গ্রামে কমান্ডার স্যারের বাড়িতে একত্রিত হই। কমান্ডার স্যারের মা আমাদের জন্য খাবার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। আমরা কমান্ডার স্যারের বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের সবাইকে বসিয়ে কমান্ডার স্যার ব্রিফ করলেন। স্থানীয়ভাবে ট্রেনিং দেওয়া বেশ কিছু যুবককে আমাদের গ্রুপে ভর্তি করা হয়েছিল। এত বড় প্লাটুন এক শেল্টারে শেল্টার নেওয়া সমস্যা। তাই কমান্ডার স্যার ডেপুটি কমান্ডার রবীন্দ্রনাথ বাগ্চীকে কমান্ডার করে আমাদের ১১ জনের আর একটি গ্রুপ করে দিলেন। এই গ্রুপ এর সবাই রাতে হেঁটে কল্যাণপুর চলে এলাম।

কল্যাণপুর যুদ্ধ

কল্যাণপুর সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি থানার একটি গ্রাম। এই যুদ্ধে নেতৃত্বে ছিলেন ডেপুটি কমান্ডার (কমান্ডার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত) বাবু রবীন্দ্রনাথ বাগ্চী। কমান্ডার স্যারের নির্দেশে আমরা ১১ জন রবীন্দ্রনাথ বাগ্চীর কমান্ড-অধীন হয়ে হেঁটে ভোরে বেলকুচি থানার কল্যাণপুর গ্রামে এক বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। ৫ নভেম্বর ৭১ বাড়ির মালিক আমাদের সকালের খাবারের ব্যবস্থা করলেন। আমরা সারারাত নিদ্রাহীন থেকে ও হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সকালের খাবার খেয়ে প্রকাশ্যে পিটি, প্যারেড করলাম। অস্ত্র পরিষ্কার করলাম। অস্ত্রে ফুলতুরী মারলাম। একজন করে করে ডিউটি করতে থাকলাম। অন্যরা ঘুম বা রেস্টে থাকলাম। কল্যাণপুর একটি নিভৃত গ্রাম। আমাদের ধারণা ছিল এই গ্রামে পাকি হানাদার ও রাজাকার আসবে না। বেলা ১০টার দিকে সেনি্ট্ররত সহযোদ্ধা রতনকুমার দাস দৌড়ে এসে জানালেন আমাদের ধরার জন্য বেলকুচি থানা থেকে কয়েকজন পাকি হানাদার মিলে শিয়া ও রাজাকার আসছে। বওড়া গ্রামের মধ্য দিয়ে কল্যাণপুরের দিকে আসছিল। দুজন পাকিস্তানি দালাল গামছা দিয়ে মুখ বেঁধে নিয়ে হানাদার ও রাজাকারদের পথ চিনিয়ে নিয়ে আসছিল। দূর থেকে অনুমান হলো এই দলে ৫ জন মিলেশিয়া ও ৮ জন রাজাকার আছে। আমাদের কমান্ডার যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আমরা কল্যাণপুরে রাস্তার ধারে বাংকারের মতো বাঁশঝাড়ের মধ্যে পজিশন নিলাম। বাঁশঝাড়ের সামনে দিয়ে চলা রাস্তা ধরে ওরা আসছিল। আমাদের রেঞ্জের মধ্যে আসার সাথে সাথে আমাদের কমান্ডার রবীন্দ্রনাথ বাগ্চী কমান্ড ও ফায়ার ওপেন করলেন। এক লাফে হানাদারেরা রাস্তার উত্তর পাশে পজিশন নিল। ওরাও আমাদের লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল। আমরাও একযোগে বৃষ্টির মতো গুলি ছুড়তে থাকলাম। গোলাগুলির শব্দ পেয়ে আশপাশে অবস্থানকারী মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপ তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে এসে ছিলেন। একঘণ্টার অধিক সময় সম্মুখযুদ্ধ চলছিল। তারপর পাকি হানাদারেরা পিছিয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধে জয়ী হয়ে আমরা বিজয় উল্লাস করেছিলাম। সকল স্তরের মানুষের আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হলো। এক বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করেছিলাম। তারপর হেঁটে দৌলতপুর গ্রামের সহযোদ্ধা শামসুল হকের বাড়িতে শেল্টার নিয়েছিলাম। কয়েক দিন দৌলতপুর, তেঞাশিয়া, খুকনী, বাজিয়ারপাড়া, দরগার চর ও অন্যান্য গ্রামে শেল্টার নিয়ে থাকলাম। প্রতিদিন রাতে কমান্ডার পাসওয়ার্ড দিতেন। প্রতিদিন সকালে অস্ত্রে ফুল থ্রু মারা হতো ও তেল দেওয়া হতো।

ধীতপুর যুদ্ধ

ধীতপুর সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর থানার একটি গ্রাম। এই যুদ্ধে নেতৃত্বে ছিলেন ডেপুটি কমান্ডার (কমান্ডার হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত) বাবু রবীন্দ্রনাথ বাগ্‌চী। ১২ ডিসেম্বর '৭১ রাতে আমাদের শেল্টার ছিল সৈয়দপুর গ্রামের কালা চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্যের বাড়িতে। ১৩ ডিসেম্বর '৭১ বেলা ১২টার দিকে সংবাদ পেলাম পাকি হানাদারেরা কৈজুরী হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। টাঙ্গাইলের যুদ্ধে পাকি হানাদারেরা পরাজিত হয়ে লঞ্চে যমুনা নদী পার হয়ে মালিপাড়া ক্যাম্পে এসেছিলেন। মালিপাড়া ক্যাম্প থেকে রাস্তা চেনানোর জন্য দুই রাজাকারকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। আমরা পাকি হানাদারদের অবজার্ভ করার জন্য ওদের পিছু নিলাম। ওরা ক্ষুধার্ত। কৈজুরী গ্রামের একজনের মুলা খেত থেকে মুলা খাওয়ার চেষ্টা করল। ওরা হয়তো জানতো না কাঁচা মুলা খাওয়া যায় না। ওয়াপদা বাঁধ ধরে ওরা অগ্রসর হতে লাগল। আমরাও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে করে ওদের পিছু পিছু যাচ্ছিলাম। ওরা ভীষণ ক্রোধী। ধীতপুর নামক স্থানে গিয়ে ওরা আমাদের দিকে অস্ত্র তাক করেছিল। আমরা জাম্প করে ওয়াপদা বাঁধের পশ্চিম দিকে পজিশন নিয়েছিলাম। পাকিস্তানি হানাদারেরা ওয়াপদা বাঁধের পূর্ব পার্শ্বে পজিশন নিয়েছিল। একঘণ্টাব্যাপী গুলি পাল্টা গুলি চলতে থাকল। গুলির শব্দে শাহজাদপুর ও বেড়া থানার বিভিন্ন স্থানে অবস্থানকারী মুক্তিযোদ্ধা দল আমাদের সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে এল। এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। হানাদারেরা গুলি করা বন্ধ করল। আমরাও অন্ধকারে গুলি করা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। সারারাত না খেয়ে পজিশন অবস্থায় ছিলাম। আমাদের গ্রুপটি ছিল বাবু রবীন্দ্রনাথ বাগচী কমান্ডানাধীন। এই ভয়াবহ যুদ্ধে বেড়া থানার বৃশালিকা গ্রামের অধিবাসী বেড়া বিবি হাই স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী আব্দুল খালেক ও ছেচানিয়া গ্রামের আমজাদ হোসেন গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন। পরে দুইজনই শহীদ হয়েছেন। ঐ দিন স্থানীয় দুজন পথচারী গোলাগুলির সময়ে গুলি লেগে মারা গিয়েছিল। আমাদের অন্যান্য গ্রুপের চারজন আহত হয়ে ছিলেন ধীতপুর যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে আমরা জামিরতা হাই স্কুলে ক্যাম্প করে অবস্থান নিয়েছিলাম। ১৪ ডিসেম্বর '৭১ শাহজাদপুর থানা হানাদারমুক্ত হয়েছিল। ১৬ ডিসেম্বর '৭১ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে, তদানীন্তন রেসকোর্স ময়দানে। পাকিস্তানি হানাদারেরা মাথা নিচু করে আত্মসমর্পণ করেছিল। ১৭ ডিসেম্বর '৭১ ভারতীয় বিমান বাহিনী বাংলাদেশের আকাশপথ ঘুরে যুদ্ধোত্তর স্বাধীন বাংলাদেশের অবস্থা দেখেছিল। ১০ জানুয়ারি '৭২ জাতির পিতা পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে এলেন। ১২ জানুয়ারি জাতির পিতা প্রথমে রাষ্ট্রপতি হিসেবে এবং পরক্ষণেই রাষ্ট্রপতি পদের ইস্তেফা দিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রথা চালু করে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। জাতির পিতা আমাদের অস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আমাদের গ্রুপ ২৪ জানুয়ারি '৭২ রবিবার সিরাজগঞ্জ সদরস্থ ইব্রাহিম বিহারী বাসায় অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের দায়িত্ব শেষ করেছিলেন। সরকার থেকে ন্যাশনাল মিলেশিয়া ক্যাম্প স্থাপন করা হলো। আমাকে ন্যাশনাল মিলেশিয়া ক্যাম্পের ভর্তির পরামর্শ দিয়ে ছিলেন। আমি ন্যাশনাল মিলেশিয়া ক্যাম্পে ভর্তি হলাম না। বাড়িতে চলে এলাম। ১০ ফেব্রুয়ারি '৭২ সিরাজগঞ্জ মহকুমা কার্যালয় থেকে জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানীর সনদ, একটি সাদা কম্বল ও বকেয়া পকেট মানি ও রেশনিং মানি হিসেবে ১১০ টাকা দেওয়া হলো। বাড়ি এসে রতন কান্দি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমার বড় দাদা দেবেন্দ্রনাথ সান্যালের কাছ থেকে অষ্টম শ্রেণির অটোপাসের টিসি নিয়ে শাহজাদপুর বহুপার্শ্বিক উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণি বিজ্ঞান ভর্তি হয়ে লেখাপড়া শুরু করেছিলেন।

চন্দনা সান্যাল : বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান; সহকারী শিক্ষক, সরকারি আইডিয়াল প্রাইমারি স্কুল, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

Tags: এক কিশোর গেরিলা মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধকথা স্মৃতিচারণ

Read Previous
কৃষ্ণচূড়া

Read Next
ড. জসীমউদ্দিন আহমেদ : '৫২-র ভাষা আন্দোলনের অনন্য পথিকৃৎ